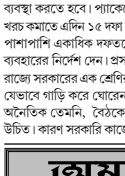

শনিবার, ৭ জুলাই ১৪২৫
বর্ষ : ১৩, সংখ্যা : ১৯০

এমন কড়া পদক্ষেপের প্রয়োজন ছিল

রাজ্যে আর্থিক সংকটের মোকাবিলায় সরকারি খরচ কমাতে মুখ্যমন্ত্রীর যে কড়া পদক্ষেপ নিয়েছেন তা অত্যন্ত সময়োচিত, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্য এবং আমলাদের নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন। এই বৈঠকে তাঁর সরাসরি নির্দেশ, সরকারি টাকার অপব্যবহার বরদাস্ত করা হবে না। খরচ কমানোর ওপর জোর দিতে হবে। বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী নবান্নে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, সরকারের টাকা মানুষের টাকা। সেই টাকা খরচ করে বিলাসিতা করা চলবে না। অপচয় কমাতে হবে। টাকা বাঁচিয়ে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। অন্যান্য মন্ত্রীদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাজেটে বরাদ্দ অর্থ ফেলে রাখলে চলবে না। অতিরিক্ত খরচ করাও চলবে না। এরজন্য প্রয়োজনে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারি অর্থের অপচয় রুখতে অত্যাধুনিক পরিকল্পনার কথা বলেছেন। আমলাদের 'ইনোভেটিভ আইডিয়া' বের করার নির্দেশ দিয়েছেন। সরকারি টাকা অপচয় রুখতে টেন্ডার বিভ্রাট বন্ধের নির্দেশও দিয়েছেন তিনি।

খরচ কমানোর জন্য নির্দেশিকার সঙ্গে সঙ্গে বৃস্পতিবারেও বৈঠকে সাদামাটা খাবারের ব্যবস্থা হয়েছিল। মেনুতে ছিল ফিশফ্রাই এবং কাটলেট। সাম্প্রতিক নির্দেশিকার বলা হয়েছে, বৈঠকে লাঞ্চের ব্যবস্থা করলেও ঢালাও খাবার আনা যাবে না। ছোট প্যাকেটে সাধারণ খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। প্যাকেটের দাম নির্দেশিকায় স্পষ্ট করা প্রয়োজন। খরচ কমাতে এদিন ১৫ দফা নির্দেশিকা জারি করেন মুখ্যসচিব মলয় দে। পাশাপাশি একাধিক দফতরের দায়িত্বে থাকা সচিবদের একটি গাড়ি ব্যবহারের নির্দেশ দেন। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে

রাজ্যে সরকারের এক শ্রেণির আমলা ভুলে যান যে তারা সরকারি অর্থে যেভাবে গাড়ি করে ঘোরেন তা জনগণের টাকায়। এভাবে টাকা খরচ অনৈতিক তেমনি, বৈঠকে এলাহী মাছ-মাংস, দই-মিষ্টি বন্ধ হওয়া উচিত। কারণ সরকারি কাজে কোনও বৈঠকে বিলাসিতা কাঙ্খিত নয়।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

সাধুসঙ্গ, তীর্থ, জ্ঞান, বৈরাগ্য এই সব আশ্রয় করে থাকে। সে বলে যদি 'আমি' সহজে চলে না যায়, তবে থাক্ শালা 'দাস' হয়ে, 'ভক্ত' হয়ে।"

"**ভক্তেরও একাকার জ্ঞান হয়;** সে দেখে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই নাই। 'স্বপ্নবৎ' বলে না, তবে বলে তিনিই এই সব হয়েছেন; মোমের বাগানে সবই মো, তবে নানা রূপ।"

"তবে পাকা ভক্তি হলে এইরূপ বোধ হয়। অনেক পিত্ত জমলে ন্যাবা লাগে; তখন দেখে যে সবই হলদে। শ্রীমতী শ্যামকে ভেবে ভেবে সমস্ত শ্যামময় দেখলে; আর নিজেকেও শ্যাম বোধ হল। পারার হ্রদে সীসে অনেকদিন থাকলেও সেটাও পারা হয়ে যায়। কুমুরেপোকা ভেবে ভেবে আরশুলা নিশ্চল হয়ে যায়। নড়ে না; শেষে কুমুরেপোকাই হয়ে যায়। ভক্তও তাঁকে ভেবে ভেবে অহংশূন্য হয়ে যায়। আর দেখে 'তিনিই আমি' 'আমিই তিনি'।"

"আরশুলা যখন কুমুরেপোকা হয়ে, তখন সব হয়ে গেল। তখনই মুক্তি।"

নানা ভাবে পূজা ও গিরিশ –'আমার মাতৃভাব'

"যতক্ষণ, আমিটা তিনি রেখে দিয়েছেন, ততক্ষণ একটি ভাব আশ্রয় করে তাঁকে ডাকতে হয়–শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য–এই সব।"

"আমি দাসী ভাবে এক বৎসর ছিলাম–ব্রহ্মময়ী দাসী। মেয়েদের কাপড় ওড়না এই সব পরতাম! মেয়ের ভাবে থাকলে কাম জয় হয়।"

"সেই আদ্যাশক্তির পূজা করতে হয়; তাঁকে প্রসন্ন করতে হয়। তিনিই মেয়েদের রূপ ধারণ করে রয়েছেন। তাই আমার মাতৃভাব।"

"মাতৃভাব অতি শুদ্ধ ভাব। তন্ত্রে বামাচারের কথাও আছে ; কিন্তু সে ভাল নয়; পতন হয়। **ভোগ রাখলেই ভয়।**"

"মাতৃভাব যেন নির্জলা একাদশী; কোন ভোগের গন্ধ নাই।

দিনপঞ্জিকা

২২ আষাঢ়, ভাঃ ১৬ আষাঢ়, **৭ জুলাই**, ২২ আহার, সংবৎ ৯ আষাঢ় বদি, ২২ শওয়াল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১, সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।২৩। **শনিবার**, নবমী রাত্রি ঘ ৭।৪৪ মিঃ। অশ্বিনীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৩।৪২ মিঃ। সুকর্ম্মাযোগ রাত্রি ঘ ১।৪২ মিঃ। তৈতিলকরণ, দিবা ঘ ৭।৫৯ গতে গড়করণ, রাত্রি ঘ ৭।৪৪ গতে বণিজকরণ। **জন্মে**–– মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যাবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, রাত্রি ঘ ৩।৪২ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। **মৃতে**– একপাদদোষ। **যোগিনী**– পূর্ব্বে, রাত্রি ঘ ৭।৪৪ গতে উত্তরে। **কালবেলাদি** ঘ ৬।৪১ মধ্যে ও ১।২২ গতে ৩।৩ মধ্যে ও ৪।৪৩ গতে ৬।২৩ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ৭।৪৩ মধ্যে ও ৩।৪২ গতে ৫।২ মধ্যে। **যাত্রা**–– নাই, দিবা ঘ ৬।৪১ গতে যাত্রা শুভ পূর্ব্বে ও দক্ষিণে নিষেধ, অপরাহ্ণ ঘ ৪।৮ গতে উত্তরেও নিষেধ, রাত্রি ঘ ৭।৪৪ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। **শুভকর্ম্ম-- বিবাহ–রাত্রি ঘ ৭।৪৩ গতে ১০।২২ মধ্যে মকর ও কুম্ভ লগ্নে পুনঃ রাত্রি ঘ ১১।৫৩ গতে ৩।৪২ মধ্যে মেষ বৃষ ও মিথুন লগ্নে সুতহিবুকযোগে যজুর্ব্বিবাহ**। **বিবিধ**– নবমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। **বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তের শহীদ দিবস** (৭ জুলাই, ১৯৩১ খ্রী)। **মাহেন্দ্রযোগ**––দিবা ঘ ৫।৫৭ মধ্যে ও ৯।৩০ গতে ১।২৯ মধ্যে। **অমৃতযোগ**–– দিবা ঘ ৩।৪২ গতে ৬।২৩ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৭।৪ গতে ৭।৪৭ মধ্যে ও ১১।২১ গতে ১।৩০ মধ্যে ও ২।৫৫ গতে ৫।২ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

২২ আষাঢ়, ভাঃ ১৬ আষাঢ়, ৭ জুলাই, ২২ শওয়াল, ২২ আহাব, উঃ ৪।৫৯, অঃ ৬।২২, শনিবার, নবমী রা ঘ ৭।৪৩, সেহ্‌রী শেষ ৩।২৫ ইফ্‌তার শেষ ৬।৩০।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে, সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনে মাতৃধাম জয়রামবাটী

দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়

১. প্রাসঙ্গিক রচনা

জগজ্জননী শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী প্রকৃতই অসামান্য শক্তিময়ী ছিলেন। অবতার বরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন---"ও সারদা, সরস্বতী, জ্ঞানদায়িনী, মহাবুদ্ধিমতী। ও কি যে সে! ও আমার শক্তি।" তাই শ্রীমা কখনও শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসহায়িকা, কখনো আরাধ্যা জগজ্জননী, কখনো তিনি সংঘজননী, আবার তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের ধাত্রী। শ্রীভগবান যখনই ধরাধামে অবতীর্ণ হন, তাঁর শক্তিস্বরূপিনী পরমাপ্রকৃতিও তাঁর সঙ্গে আসেন। শিবস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে শক্তিরূপা শ্রীমায়ের মহামিলন ঘটেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ মাত্র পঞ্চাশ বৎসরের সীমাবদ্ধ জীবনে উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভবিষ্যতে যাঁরা তাঁর বাণী ও সাধনার ধারা বহন করে নিয়ে যাবেন, তাঁদের মধ্যে শ্রীমায়ের স্থান সর্বাগ্রে। তিনি শ্রীমাকে বলেছিলেন, "আমি আর কী করেছি, তোমাকে আরো করতে হবে।" শ্রীমাকে সত্যিই সত্যিই তাঁর নির্দিষ্ট ভূমিকায় স্বেচ্ছায় পালন করতে এগিয়ে আসতে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ নিশ্চিন্ত ও আনন্দিত হয়েছিলেন।

মানবকল্যাণের যে মহানব্রত শ্রীরামকৃষ্ণ উদ্যাপন করেছিলেন, সেই মহানব্রতের উত্তরাধিকারিণী ও সহধর্মিণী শ্রীমাকে তিনি সেবা, পূজা, তপস্যা, আরাধনা—সর্বদিক দিয়েই তাঁর যোগ্য প্রতিনিধি করে তুলেছিলেন। শুধু তাই নয়, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে ষোড়শীরূপে পূজা করে নিজ সর্বসাধনার ফল তাঁর শ্রীচরণে অর্পণ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে শ্রীমায়ের গুরুশক্তির সাহায্য লাভ করেছিলেন প্রায় দেড় সহস্রাধিক ত্যাগী ও গৃহী মন্ত্রশিষ্য। সেই সময় কলকাতা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের কতজন ভক্ত নরনারী জয়রামবাটী ও বাগবাজারে এসেছিলেন তার সঠিক হিসাব নেই। শ্রীমা জয়রামবাটীতে তাঁদের পুরাতন বাড়ি ও নূতন বাড়িতে থেকে বহু ভক্তকে মন্ত্রদীক্ষা, ব্রহ্মচর্য ও সন্যাস দিয়ে কৃতার্থ করেছিলেন। যারফলে পরবর্তী জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণরূপ বটতরুতলে সমাশ্রিত গৃহী বা সন্যাসী সব ধরনের ভক্তের কাছেই তিনি সেবাময়ী, স্নেহময়ী, চৈতন্যরূপিনী, পরমা মাতৃকাশক্তিরূপে প্রকাশিতা।

শ্রীরামকৃষ্ণ লীলার উজ্জ্বল সঙ্গিনী শ্রীমা সিংহভাগ দায়দায়িত্ব কালের প্রেক্ষিতে নিজেই কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন আধুনিক ভারতের ইতিহাসে এক নব সন্যাসের আদর্শ প্রবর্তন করেছে। যার মর্ম বুঝতে হলে এই আন্দোলনে শ্রীমায়ের ভূমিকা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের সংঘজননীরূপে শ্রীমাকে সার্বিকরূপেই গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৯৭ খ্রিঃ ১ মে স্বামীজী রামকৃষ্ণমিশনের প্রতিষ্ঠাসভায় বলেছিলেন, "তোমাদের এই যে সঙ্ঘ হতে চলেছে, তিনি (শ্রীমা) তার রক্ষাকর্ত্রী, পালনকারিনী, তিনি আমাদের সঙ্ঘ জননী।"

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের ঢেউ আজ সমগ্র বিশ্বজুড়ে প্রতিটি ঘরের দরজায় আছড়ে পড়েছে—এ কথা প্রমাণিত সত্য। সেবা ও সাধনা-এই দুয়ের মহাসম্মেলনে শ্রীরামকৃষ্ণ-আন্দোলন আধুনিক ভারতবর্ষে ধর্মচেতনায় রূপান্তর ঘটিয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' রূপ মন্ত্র স্বামীজীর 'দরিদ্রনারায়ণ সেবা'র উদাত্ত আহ্বানে পরিণত হয়ে ভাবী গণ সচেতন রাষ্ট্র-আন্দোলনের আদর্শকে অনেক পরিমাণে উদ্বুদ্ধ করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ পণ্ডিত খুঁজতেন না, খুঁজতেন মানুষ। যাঁরা তাঁর বাণীর মর্ম বুঝবেন, আর তাঁকে অবলম্বন করে বেঁচে থাকবেন। উত্তর পুরুষের সৌভাগ্য, এ ধরনের মানুষেরা আসেন নরেন ওরফে স্বামী বিবেকানন্দের নেতৃত্বে। তারপরই এদেশে এবং বিদেশে শ্রীরামকৃষ্ণ-আন্দোলন মঙ্গলের স্থায়ী শক্তি হিসাবে দেখা দিয়েছে। যতই দিন গেছে, তাঁর ভাবধারা অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-আন্দোলন ততই জোরদার হয়ে উঠেছে। আর যেখানেই শ্রীরামকৃষ্ণের-ভাবধারা পৌঁছাচ্ছে, সেখানেই গভীর প্রভাব রাখছে। শ্রীরামকৃষ্ণ যে ভাবধারা প্রচার করেছিলেন, তা পৃথিবীর দূরবর্তীস্থানেও পৌঁছাচ্ছে, সংগঠন বা ভক্তদের জন্য নয়, তাঁর অন্তর্নিহিত শক্তির জোরে।

শ্রীমাকে কেন্দ্র করে যে নবযুগের সূচনা হয়েছে, তাকে 'সারদা যুগ' বলে চিহ্নিত করা চলে। স্বামী বিশুদ্ধানন্দ একবার প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণাকে বলেছিলেন, "তুমি কি জান, বর্তমানে 'রামকৃষ্ণ যুগ' শেষ হয়েছে এবং 'সারদা যুগ' শুরু হয়েছে। এখন শ্রীরামকৃষ্ণ শিবের মতন মাটিতে শুয়ে আছেন, আর সারদাদেবী কালীর মতন তাঁর উপর দাঁড়িয়ে আছেন এবং নৃত্য করছেন"[১] শিব ও শিবানীর এই অভিনব সম্মিলনে বর্তমান পৃথিবীর সর্বত্রই শক্তি জাগ্রতা হয়েছেন। স্বামী সারদেশানন্দকে যোগীনমা বলেছিলেন, "যা কিছু দেখছ (মঠ-আশ্রমাদি) সব ওঁরই (শ্রীমায়ের) কৃপায়। যেখানে যা দেখছেন--শিল্‌টি নোড়াটি (দেববিগ্রহ)-- কেঁদে কেঁদে বলেছেন, 'ঠাকুর! আমার ছেলেদের একটু মাথা রাখবার জায়গা কর, দুটি খাবার সংস্থান কর'।[২]

আজ জগৎজুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ পরিবার। সারা বিশ্বে আজ শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বিস্মৃতি। তাই, শ্রীমায়ের জন্মভূমি ও লীলাভূমি জয়রামবাটীর অবস্থান বিশ্বের আধ্যাত্মিক মানচিত্রে বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত। সারা বিশ্বের মানুষের মাঝে জীবনের কাঙ্খিত লক্ষ্যে উত্তরণের পীঠস্থান। শ্রীরামকৃষ্ণ যদি 'শিব' হন, শ্রীমা তবে 'সতী'। সেই সতীদাহের পবিত্র অঙ্গাদিপতনের ফলে নানাস্থানে যেমন শক্তিপীঠের প্রকাশ, মনুষ্যরূপিনী দেবীদেবে স্বয়ং সতীর প্রকাশের ফলে জয়রামবাটী তাই মহাশক্তিপীঠ। আবার ভক্তদের কাছে কেবলমাত্র মহাশক্তিপীঠই নয়, মহাপূণ্যপীঠ। এখানেই দেবীদেহে পরমাশক্তির বিকাশ, আবার এখানেই বিশাল আত্মিকসত্তায় ভগবান-ভগবতীর মিলন। এ যুগের মহাশক্তিপীঠ জয়রামবাটীতে মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠার পরই স্বামী সারদানন্দের (শরৎ মহারাজ) জীবনের বিশাল কর্মকাণ্ডের অন্যতম পর্বটি ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবগ্রাহীদের মহাসম্মেলন, যেটি ভবিষ্যতের কর্মপন্থার দিগদর্শন। তাই, শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের অন্যতম নজির হিসাবে মাতৃধাম জয়রামবাটীর অবদান কম নয়। কেননা, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা পৃথক নন। শ্রীমা স্বয়ং বলেছেন, "ঠাকুরকে ও আমাকে এক দেখবে, আলাদা দেখো না।....আমাদের যা কিছু সবের মূল ঠাকুর--তিনিই আদর্শ। যা কিছু কর না কেন, তাঁকে ধরে থাকলে কোনও বেচাল হবে না।" স্বামী গম্ভীরানন্দজী লিখেছেন, "শ্রীমায়ের বিশ্বাস ছিল যে, সঙ্ঘের মধ্যে দিয়া ঠাকুর তাঁহার নূতন ভাবধারার প্রচার অবশ্যই করিবেন। জনৈক মঠাধ্যক্ষ যখন তাঁহার নিকট একদিন দুঃখ করিয়া বলিলেন যে, দেশের লোকের মতিগতি অনুকূল না হওয়ায় কাজ আশানুরূপ অগ্রসর হইতেছে না, কারণ দেশের লোক ভঙ্গিতেই জানে, গাড়িতে সাহায্য করে না। তখন শ্রীমা আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "বাবা, ঠাকুর বলতেন, 'মলয়ের হাওয়া লাগলে যে সব গাছের সার আছে, তারা চন্দন হয়,' মলয় বলে গেছে। এইবার সব চন্দন হবে–কেবল বাঁশ, কলা ছাড়া।[৩]

২. অতীতের গ্রামখানি

'জয়রামবাটী' পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার এমন একটি গণ্ডগ্রাম, যা তৎকালীন পরাধীন ভারতের অপর গ্রামগুলির মতই ছিল অবহেলিত। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে, এমনকি বঙ্গদেশের মানচিত্রে কিছুকাল আগেও এই গ্রামের কোনো উল্লেখ ছিল না এবং ভূগোলের পাঠ্যেও এর পরিচিতি ছিল না। জয়রামবাটী পূর্বে 'তেঁতুলমুড়ি' নামেও পরিচিত ছিল।

স্বামী পরমেশ্বরানন্দজী লিখেছেন, "তখনকার দিনে জয়রামবাটী গ্রাম 'তেঁতুলমুড়ি' নামেও পরিচিত ছিল। গ্রামে মাত্র দু-তিনজন শিক্ষিত লোক ছিলেন, তাঁহারা বিদেশে থাকিতেন। গ্রামখানির খুবই দূরবস্থা ছিল, পথঘাট খুবই খারাপ। গ্রামের মাঝখান দিয়া যাতায়াতের পথ, সেই পথের মধ্যেই একটি নালা। বর্ষাকালে ঐ নালা জলে পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। তাহাতে গ্রামের দক্ষিণপ্রান্তের ঘরবাড়ি ভাসিয়া যাইত। সেই বর্ষায় জলে গ্রামের রাস্তা ও পুণ্যপুকুর সব একাকার হইয়া যাইত। কোথাও কোথাও রাস্তায় এত কাদা হইত যে অনেকসময় গরু কাদায় পড়িয়া যাইত, বাঁশ দিয়া উহাদের তুলিয়া আনা হইত। গ্রামের মধ্যে বাঁড়ুয্যে-পরিবারই অনেকটা ভদ্রতা ও কৌলিন্য বজায় রাখিয়া চলিতেন। পাঠশালায় সামান্য অধ্যয়ণ ব্যতীত ছেলেদের লেখাপড়া শিখিবার আর কোনও সুযোগ ছিল না। দু-চারজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি চাকুরি করিত, আর প্রায় সকলেই চাষবাস করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিত। গ্রামের লোকেদের মধ্যে দলাদলি ও পরস্পরের মধ্যে বিশেষ ভাব ছিল।[৪]

ক্রমশ

পালরাজা রাম পালের সামন্তচক্রের সন্ধানে (ঢেক্কুরির প্রতাপ সিংহ)

আব্দুর রহমান
শেষ পর্ব

উত্তরবঙ্গে যখন দিব্যক ও ভীমের নেতৃত্বে কৈবর্ত বিদ্রোহ দেখা দেয়, তখন ওই বিদ্রোহ শেষ করার জন্য আমরা যে চৌদ্দজন সামন্ত রাজার নামের তালিকা পেয়েছি তাদের সাহায্যে পালরাজ রাম পাল কৈবর্ত বিদ্রোহ দমন করেন এবং উত্তরাঞ্চল পুনরুদ্ধার হয়। এই সামন্ত রাজাদেরই একজন ছিলেন প্রতাপ সিহি বা প্রতাপ সিংহ।

ঢেক্কুরির অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা কিছু মূর্তি ও ইট অর্থাৎ প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশন পেয়েছি। জনশ্রুতি অনুযায়ী শ্রীখন্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে কালিপুকুর সংস্কার কালে ওই পুকুর হতে অনেক পাথরের দেবমূর্তি উদ্ধার হয়েছিল এবং সেগুলি ওই পুকুরের তীরে ষষ্ঠীতলায় সংরক্ষিত ছিল। মূর্তিগুলি যে পালযুগের তা চিহ্নিত করেন রাজুয়া নিবাসী প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ মহম্মদ আয়ুব হোসেন। সেই মূর্তিগুলি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের যাদুঘরে সংরক্ষিত করার জন্য প্রশাসক কর্তৃপক্ষ নিয়ে যায়। ওই পুকুর হতে একটি বেশ সুন্দর লোহার থাম পাওয়া যায়। দেকুড়ির কানাই ঘোষ নিজের ঘরে লাগাবেন বলে সেটি নিয়ে যান। কিন্তু তাঁর ভেদবমি শুরু হওয়ায় তিনি সেটি পুনরায় ওই পুকুরে ফেলে দেন। ওই পুকুরের মধ্যে অনেক নীচে একটা লোহার সিন্দুকের মত জিনিস আছে বলে শোনা যায়। ওই দিনই প্রচন্ড বৃষ্টিতে আবার পুকুরটি ভর্তি হয়ে যাওয়ায় সেটি উত্তোলন করা সম্ভব হয়নি। জনশ্রুতি আছে যে দেকুড়ির বর্তমান বেনেপাড়ায় ছিল রাজাদের আস্তাবল। দেকুড়ি সংলগ্ন যে সমস্ত ডাঙ্গা যেমন, বামুডাঙ্গা, কুমড়োডাঙ্গা, বাঁদিডাঙ্গা, ঘুটকেডাঙ্গা, ডাঙ্গাস, এই সমস্ত স্থানে জনবসতি ছিল। ওই সমস্ত স্থানে অনেক ইটের টুকরো ও খোলামকুচিতে ভর্তি ছিল। ওই ডাঙ্গাগুলি এখন কৃষি জমিতে পর্যবসিত। এছাড়াও গাঙ্গুলীডাঙ্গা ও কোশী গ্রামের মধ্যবর্তী স্থানে রামপাল দীঘি, নহাটা, খেড়ুয়া ও কানাইডাঙ্গায় প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্তিগুলি নিঃসন্দেহে পাল যুগের।

ঢেক্কুরি ও ঢেকুর প্রসঙ্গে ঃ- অনেকে মনে করেন ঢেক্কুরির ঈশ্বর ঘোষ ও ঢেকুরের ঈশ্বর ঘোষ (ইচ্ছাই ঘোষ) একই ব্যক্তি। কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত। কারণ, ঢেক্কুরির ঈশ্বর ঘোষের প্রপিতামহ ছিলেন ধূর্ত ঘোষ, পিতামহ ছিলেন বল ঘোষ এবং পিতা ছিল ধবল ঘোষ। পক্ষান্তরে আমরা ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে পাই ঢেকুরের পূর্বনাম ছিল ত্রিষষ্ঠীর গড়।

ধর্ম মঙ্গলের ৯৭ থেকে ৯৯ পাতায় ৪০নং পদে আছে ঃ-

"বারোভুঁইঞা মাঝে যার কথা নাহি নড়ে,
হে কর্ণ সেন রায় ত্রিষষ্ঠীর গড়ে।।"

আবার ৭০নং পদে আছে ঃ-

"বিপক্ষ করিলে বল বাড়িবে নদীর জল
অরি প্রবেশিতে নারে পুর।
অপর প্রার্থনা শুন ত্রিষষ্ঠীর গড় পুন নাম হতে অজয় ঢেকুর।।"

আবার ৯৯ পাতায় ১১৫ নং পদে দেখি ঃ-

"তোমার দোহাই রাজা আমি হৈনু দূর।
ত্রিষষ্ঠীর ঘুচায়ে নাম হয়েছে ঢেকুর।।
ত্রিষষ্ঠীর গড়ের সানা দেবল শ্রীযূত।
সোম ঘোষ প্রতি প্রেম শুভাশী বহুত।।"

(১) উক্ত পংগুলি হতে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, ঢেকরের ঈশ্বর ঘোষের পিতা নাম ছিল সোম ঘোষ এবং অজয় তীরে তাঁর রাজধানী ছিল। ত্রিষষ্ঠীর গড় যা পরবর্তী সময়ে ঢেকুর নামে পরিচিত হয়।

(২) ইচ্ছাই ঘোষ বা ঈশ্বর ঘোষের রাজধানী ছিল বর্ধমান জেলার আউশগ্রামের জঙ্গলমহলের অজয় নদীর তীরে।

আর অপর ঈশ্বর ঘোষের রাজধানী ছিল বর্ধমান জেলারই কাটোয়া থানার অন্তর্গত জটোদা নদীর তীরে।

(৩) ঐতিহাসিকদের মতামত ঃ- ড. নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালির ইতিহাস' গ্রন্থে ৩৯০-৩৯৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন যে, মহামাঙ্গলিক ঈশ্বর ঘোষ নামে এক সামন্ত রাজা ১০৫০-১০৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধমান অঞ্চলে স্বাধীন স্বতন্ত্র মহা বিরাজরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। এর কেন্দ্রবিন্দু ছিল বর্ধমান জেলার ঢেক্কুরি নামক স্থান।

(৪) সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' গ্রন্থে ঢেক্কুরির শাসক ঈশ্বর ঘোষ (ইচ্ছাই ঘোষ) এর রাজধানী ঢেকুর যে সম্পূর্ণ পৃথক এ বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই।

উপসংহার ঃ- আমাদের দেশে প্রাচীন ইতিহাসের অনেক উপাদান এবং প্রাচীন ইতিহাস-বিখ্যাত স্থানগুলি বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে। পালরাজা রাম পালের ১৪ জন সামন্তরাজা এই রাঢ় দেশে রাজত্ব করতেন।

দু-একজনকে বিহার বা ঝাড়খন্ডে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু পাল রাজা রাম পালের অধিকাংশ সামন্ত রাজার ইতিহাস বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়নি। শুধুমাত্র খ্যাতনামা ঐতিহাসিকগণ এদের নাম করে স্থান উল্লেখ করে গিয়েছেন। ঢেক্কুরি এবং ঢেকুরকে এক করে দেখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ঢেক্কুরি ও ঢেকুর যে আলাদা আমরা সেই তথ্য এখানে আলোচনা করে দেখিয়েছি।

বর্তমান দেকুড়ি বা অতীতের ঢেক্করি একটি অবহেলিত গ্রাম। এই গ্রামে যথাযথভাবেই অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করলে এখানকার পুকুরগুলি থেকে পাল যুগের অনেক কিছুর নিদর্শন মিলতে পারে এবং এই গ্রামে ষষ্ঠীতলায় অবস্থিত যে ঢিবিটি রয়েছে সেটি উৎখননের প্রয়োজন।

আমি অনুসন্ধিৎসু তরুণ তরুণী, ইতিহাস গবেষক এবং পশ্চিবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

সূত্র ঃ-

১) সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত'।
২) ডঃ নীরারঞ্জন রায়ের 'বাঙালীর ইতিহাস'।
৩) ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকারের 'পাল ও সেন যুগের বংশানুচরিত'।
৪) শ্রীঘনরাম চক্রবর্তীর 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য।
৫) ডঃ মহম্মদ আয়ুব হোসেন, রাজুয়া-চুড়ামুণী-বর্ধমান।

সম্পাদক সমীপেষু

উপহারের পত্রগুলি হারিয়ে যাচ্ছে

বাংলায় বলা হয় উপহার। উর্দুতে নজরানা বলা হয়। অর্থাৎ একটা উপহার তার বোধ হয় কোনো মূল্য ধরা হয় না। উপহার থেকে যা পেলাম, সেটাই আমার কাছে মহামূল্যবান। যা অনেক বছর যত্ন করে রাখা যায়। যার মূল্য ধরা হয় না। কারণ সেটা উপহার স্বরূপ পেয়েছি। নতুন বছর আবার এসে গেল। ২০১৭ সালকে যেমন বিদায় জানালাম, আবার ২০১৮ সালকে স্বাগত জানালাম। একসাথে বলতে শুরু করে দিলাম হ্যাপি নিউ ইয়ার। এই বছরের সূত্রপাত হলেই দেখতাম দোকানে দোকানে ভিড় লেগে গেছে। সেখানে নারী পুরুষ উভয়েই এসে উপহারের পত্রগুলি কিনে ও খামেতে ভরে, এক বন্ধু অপর বন্ধুকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাতেন। এটা শুধু বাংলার সংস্কৃতি ছিল না, সমগ্র ভারতবর্ষের সংস্কৃতিতে এই উপহারের পত্রপ্রেরণ জড়িয়ে ছিল। সেদিন এই উপহারের পত্রগুলি পাওয়ার পর একটা আলাদা রকমের অনুভূতি হত। এখানে সেই উপহারের পত্রগুলির মধ্যে থাকতো কিছু কবিতা কিছু কথা কিছু মনের কথাও। এর দ্বারা একটা সম্পর্ক গড়ে উঠতো। কেবলমাত্র প্রেম বা ভালোবাসা নয়, এই পত্রে মৈত্রীবন্ধনও গড়ে উঠতো। যারা মনে করে উপহারের পত্র মানেই প্রেমিক-প্রেমিকার সেতু বন্ধন, তাদের ধারণাটা একেবারে ভুল। উপহারের এই পত্র পুত্র তার পিতা-মাতাকে দিতে পারে, ভাই তার বোনকে দিতে পারে, একজন বন্ধু তার বন্ধুকে দিতে পারে। যাতে সম্পর্ক অটুট থাকে। যাতে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের আপন হয়ে একসাথে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে থাকতে পারে। আজ আমরা দোকানে গেলে তেমনভাবে উপহারের পত্রগুলি দেখতে পাই না বললে ভালো হয়। আমাদের মন থেকে সেই ভালোবাসাটাই চলে গেছে। যার দরুণ উপহারের পত্রগুলি আজ বড় বেমানান হয়ে গেছে। আজ আমরা অনেকটা স্মার্ট হয়ে গেছি, তাই হারিয়ে গেছে আমাদের জীবন থেকে গ্রিটিংস্ কার্ড।

প্রবীর মিত্র
হাওড়া

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা
চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২
Email-lipiarambagh@gmail.com

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়